ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাঙালির শিক্ষাব্যবস্থা

অভিষেক মুসিব. অধ্যাপক, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

টোল চতুষ্পাঠী পেরিয়ে উনিশ শতকে বাঙালি 'স্কুল' নামক প্রতিষ্ঠানকে পাওয়ার পর শিক্ষাব্যবস্থার নতুন রূপ দেখতে পেলাম আমরা। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এতদিনকার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ভাটা পড়তে থাকে। রুচি নির্মিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে, প্রাক ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি সমাজে দু'ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। (১) যেখানে বই পড়া হত (লিখতে পড়তে জানা) আর (২) দ্বিতীয় ধারাটি হল অক্ষরের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই কিন্তু অনেক জ্ঞান আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃততে পাই-

"মাস্টার : আচ্ছা ইনি কি খুব বই-টই পড়েন ?

বৃন্দে (ঝি) : আর বাবা বই-টই সব ওঁর মুখে। মাস্টার সবে পড়াশুনা করে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বই পড়েন না শুনে আরও অবাক হলেন।"

কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজ আসার পর থেকেই ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এই শিক্ষাবিস্তার প্রসঙ্গে রামকমল সেন একটি বই প্রকাশ করেন তাতে তিনি বলেন –"In 1774 the Supreme Court was established here, and from this period a knowledge of the English language appeared to be desirable and necessary." এই ইংরেজি শিক্ষা ব্যবহারের অন্যতম কারণ ছিল কোর্ট কাছারির উপযুক্ত ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করা। প্রাক ঔপনিবেশিক আমলে রাজভাষা ছিল ফার্সী ভাষা কিন্তু ব্রিটিশ আমলে তা অচিরেই পরিবর্তিত হল ইংরেজি ভাষাতে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য বিদ্যার দিকে মধ্যবিত্ত বাঙালি ঝুঁকতে থাকল। রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা গ্রন্থ 'সেকাল ও একাল' (১৮৪৮) যা ১৮৭৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এই বইতে তিনি তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানান যে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় ছড়ার মাধ্যমে ইংরেজি প্রতিশব্দ শেখানো হতো। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল এই শিক্ষা ব্যবস্থা মেকি এবং এই প্রণালীকে তিনি মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি কেননা এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ বা রুচিবোধ তৈরী হতে পারে না। রামকৃষ্ণদেবও এই শিক্ষাব্যবস্থাকে পছন্দ করতেন না, তিনি প্রাক ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রণালীতে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাক ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল প্রবাসী পত্রিকায় লেখেন – "ইংরেজ আসিবার পর এখন যত লোক লিখিতে পড়িতে শেখে তখন তত লোক লেখাপড়া শিখিত না ইহা সত্য; কিন্তু লেখাপড়া না শিখিয়াও নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ছিল (সত্তর বৎসর / বিপিনচন্দ্র পাল)। সমাজে তখন একধরণের লোকশিক্ষা, জ্ঞানলাভমূলক শিক্ষার প্রচলন ছিল। লোকশিক্ষা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় জানান – 'ইহা কখনোও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ জ্যামিতি সাহিত্য শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। ...একটা লোক শিক্ষার উপায়ের কথা বলি – সে দিনও ছিল আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। ... ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যাতীত বর্ধিত হইতেছে না। (বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ অগ্রহায়ণ)

তোতা বানানোর শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের শিক্ষা এক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে

ভাবনার সাজুয্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র লোকশিক্ষার কথা বলেছেন। ঔপনিবেশিক শিক্ষার চাপে লোকশিক্ষা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো নৈতিকতার মানদণ্ড স্থির হয় না। ইতিমধ্যেই এই ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি ব্রিটিশদের জন্য কাজের সুবিধার্থে বাংলা গদ্য নতুন রূপে পায়। একথা ঠিক ব্রিটিশরা এদেশে না এলে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, কিন্তু বলা ভালো তাঁরা না এলে আমরা বাংলা ভাষাটাও ঠিক করে জানতে পারতাম না। বাংলা গদ্যের নব দিগন্ত শুরু হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর দ্বারা কিন্তু এদের হাত ধরে যে গদ্য উঠে এল তাতে বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা পেলাম না অথচ যা পেলাম তাও কোনো অংশে কম নয়। আমাদের প্রথম গদ্য গ্রন্থের - প্রকাশ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে আর তার মাত্র ১৭ বছর পর বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' আমরা হাতে পেলাম আর কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই প্রকাশিত হয় 'বেঙ্গল গেজেট'। এখানে উল্লেখ্য বেঙ্গল গেজেট বাঙালীদের দ্বারা সম্পাদিত বাংলা ভাষায় প্রথম পত্রিকা। অর্থাৎ শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ভূমিকা নিতে শুরু করে। এই সময়পর্বেই উঠে এলেন রামমোহন রায়। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন বাংলা গদ্যের উন্নতিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেননি ঠিকই কিন্তু তিনি অনুদিত গ্রন্থগুলির দ্বারা শাস্ত্রপাঠকে ব্রাহ্মণ সমাজের বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে এলেন। বাঙালীর শিক্ষাবোধ ও রুচি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও যুক্তিবাদের আলোয় বিবেচিত হতে থাকল। রামমোহন রায় বাংলা গদ্যকে ভাষা চর্চার অভিমুখ থেকে যুক্তি ও তর্কশাস্ত্রের দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। বাংলা শিক্ষাবোধের ধারণায় শাস্ত্র নামক বিষয়টি গুরুত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা শিক্ষাধারায় ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা চলে আসে। এই সময় থেকেই বাঙালির শিক্ষা ব্যবস্থা গদ্য মাধ্যমে তিনটি দিকে প্রবাহিত হয় ধর্মকে কেন্দ্র করে। একদিকে চলতে থাকে ইউরোপীয় মিশনারী কর্তৃক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারমূলক শিক্ষা, অপরদিকে হিন্দুদের পুতুল পূজার বিধান, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিল ব্রাহ্মধর্ম। বাঙালীর এই সংকটময় পরিবেশে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। একদিকে প্রাচীন শিক্ষার আকর্ষণ আবার অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আধুনিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া কোনটিকে বেছে নেবে আপামর বাঙালী আর সেই শিক্ষার মাধ্যমেই বা কি হবে তা নিয়ে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ যখন চিন্তিত ও দ্বিধাগ্রস্ত তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালীদের কাছে নতুন পথ দেখালেন। তিনি নিজে ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত কলেজে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন চ্যালেঞ্জ রূপে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েননি। আর ধর্ম তো নয়ই, তাই বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরলেন সংস্কৃত ভাষার পাঠ্যক্রম। তিনি মনে করতেন মাতৃভাষাকে ভালোভাবে জানার জন্য সংস্কৃত ভাষা জানাটাও জরুরি কেননা বাংলা ভাষার সঙ্গে এর নাড়ীর যোগ। তাই তিনি ছাত্রদেরকে প্রথমে সংস্কৃত ভাষা ভাষা শিখিয়ে তারপর ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান দানের পক্ষে রায় দিলেন। তিনি মনে করতেন পাশ্চাত্য বা ইংরেজি ভাষার সাহায্যেই সর্বাধিক বিজ্ঞান চর্চার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এখানে খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে যে যুক্তি শাস্ত্র ও নীরস জ্ঞান চর্চা বাঙালি সমাজে তুমুল আলোড়োন তুলেছিল তার কেন্দ্রে ছিল পুরুষ শাসিত সমাজ। নারী সমাজ এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত ছিল। অথচ ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ডিরোজিও ও নব্য যুবসম্প্রদায় কর্তৃক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে কিন্তু সেই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের সনাতন সংস্কারকে আঘাত করা। সবাইকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসা নয়, আর মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেও তারাও ছিল নিশ্চুপ। রাজা রামমোহন রায় স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে উদ্যোগী হননি। সমাজের উন্নতিতে মেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা সেদিনকার তথাকথিত পুরুষ সমাজ প্রবলভাবে অস্বীকার করে। মেয়েদের সম্পূর্ণভাবে

দমিয়ে রাখা হত শিক্ষার দিক থেকে। রাসসুন্দরী দেবী 'আমার জীবন' গ্রন্থ থেকে জানা যায় – সেকালে লোকেরা বলিত এ আবার কি ? মেয়েছেলে লেখা পড়া করিতেছে ? মেয়েছেলের লেখাপড়া করা বড় দোষ, মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে সর্বনাশ হয়, মেয়েছেলের কাগজ কলম হাতে করিতে নাই।" শুধু এটুকু বলেই সমাজ ক্ষান্ত থাকত না। মেয়েদের দূর্বলতম জায়গায় খোঁচা দিয়ে বলা হত – 'লেখাপড়া শিখিলে নাকি মেয়েরা বিধবা হয়।' আর বামাবোধিনী পত্রিকায় রাজবালা দেবী সেই ভাষায় অভিযোগ আনেন – "মেয়েদের এই হীনাবস্থার জন্য সমাজ ও পুরুষেরা দায়ী।" মেয়েদের লেখাপড়া শেখা উচিত একথা উনিশ শতকে অনেক সমাজবিদ ভেবেছেন কিন্তুফলপ্রসু করেননি বা সেভাবে সফল হননি।

বাংলায় প্রথম স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের উদ্যোগ নেন খ্রীষ্টান মিশনারিরা, কিন্তু তাদের স্কুলে কোন ধনী ঘরের মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করতে এলেন না। কিন্তু উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরই প্রথম মেয়েদের সামাজিক সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিলেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ বেথুন সাহেবের উদ্যোগে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যার সেক্রেটারি ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই স্কুলে পড়াতে এলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা সৌদামিনি দেবী। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা। হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের পূর্বে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগেরর বন্ধু কালিকৃষ্ণ মিত্র ও প্যারিচরণ সরকার এবং নবীনকৃষ্ণ মিত্রের প্রচেষ্টায় বারাসাতে দুটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগরের মনে প্রাণে অনুভব করলেন আমাদের সমাজের উন্নতির প্রধান অন্তরায় হল সংস্কার প্রথা। এই সংস্কার প্রথার বিরুদ্ধে লড়তে হলে মেয়েদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে হবে। ইংরেজী প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হল। বিদ্যাসাগর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৮৫৭ থেকে ১৮৬০ এর মধ্যে শহর কলকাতা ও মফঃস্বলে৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপনের পর প্রথম যে সমস্যা দেখা দিল তা হল উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকার অভাব। আর দ্বিতীয় সমস্যা হল ছাত্রছাত্রীরা কোন্ বিষয়গুলিকে পাঠ্যক্রম হিসাবে বেছে নেবে ? এই দুটি সমস্যার ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের সহযোগী হিসাবে মেরী কার্পেন্টার মহিলা বিদ্যালয়ের পাঠ্যদানের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক চেয়েছিলেন এবং তাদের জন্য একটি ট্রেনিং স্কুল থাকা জরুরী বলে মনে করেছিলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর একে সমর্থন করেও এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে জানান, 'শিক্ষয়িথীর্দের জন্য একটি ট্রেনিং স্কুল থাকা উচিত। মেরী কার্পেন্টারের এই অভিমত নীতিগতভাবে ঠিক, কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে অকেজো। অল্প সংখ্যক সহায় সম্বলহীনা বিধবা ভিন্ন এই প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রী লোক পাওয়া যাবে না, যেহেতু জনমত স্ত্রীলোকদের এই উপজীবিকা অবলম্বনে বিরোধী'। যার ফলশ্রুতি আমরা নর্মাল স্কুলের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম সেখানে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী না পাওয়ার কারণে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুলটিকে বন্ধ করে দিতে হয়। সুতরাং বিদ্যাসাগর বাঙালীদের বিশেষ করে মেয়েদেরকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নীতির চেয়ে পরিকাঠামোকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরিকাঠামো ছাড়া নীতি যে অকেজো তা তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রম রূপে এক অভিনব উদ্যোগ নেন বিদ্যাসাগর। কেবলমাত্র শিক্ষাদান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, শিক্ষার আত্তিকরণ করতে হলে সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষার্থীর হাতে হাতে বই পৌঁছানো যা উনিশ শতকে ছিল একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষার যুগে যা ছিল অত্যন্ত একটি জরুরী বিষয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় অচিরেই এই অভাব দূর করলেন। তিনি তাঁর চাকরিহীন অবস্থায় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন

করেন সংস্কৃত প্রেস। তিনি স্থির করলেন বেশ কিছু সুপ্রাচীন সংস্কৃত ও বিভিন্ন পাঠ্যক্রম এবং উপযুক্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা দরকার। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি মূলত তিন শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের উপর জোর দিলেন।

প্রথমত: তিনি স্থান দেন সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থগুলিকে, দ্বিতীয়ত: স্থান দেন সম্পাদিত সংস্কৃত সাহিত্যকে, আর তৃতীয়ত: বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী (শিশুর শিক্ষাবোধের উপর) নিজ রচিত বাংলা গ্রন্থগুলিকে। শিক্ষার প্রথমেই তিনি সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তি ও সুশৃঙ্খল বিন্যাস অনুযায়ী তৈরী করলেন 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। পরক্রমে সংস্কৃত ভাষার দুরূহ কাটিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দিলেন তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'ঋজুপাঠ'।

সংস্কৃত সাহিত্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য একের পর এক গ্রন্থ সম্পাদনা করেন যথা কালিদাস রচিত গ্রন্থাবলী, বানের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিতম', ভব ভূতির 'উত্তরামচরিতম' ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরে অন্যতম কৃতিত্ব হল তিনি বাংলা গদ্যের অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতা দান করলেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দানের জন্য একেবারে গোড়া থেকে শুরু করেন। লিপির পরিচয় দানের জন্য তৈরী করলেন বর্ণমালা। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ। 'বর্ণপরিচয়' বাঙালীদের কাছে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এই গ্রন্থের দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের কাছে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ ও পার্থক্য তৈরী করতে শেখালেন। ক্রমশ তিনি ছাত্রপোযোগী বিভিন্ন মানের বই লিখলেন। যথা বোধদয়, কথামালা, চরিতাবলী এই বইগুলির দ্বারা একদিকে তিনি যেমন ছাত্রদেরকে আমাদের প্রাচীন গল্পকথা ও বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে চাইলেন। তেমনি অপরদিকে মহাপুরুষদের জীবনীকে তুলে আনাই ছিল অন্যতম লক্ষ্য। শুধুমাত্র বাংলা বা সংস্কৃত সাহিত্য নয়। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতিও বিদ্যাসাগরের ঝোঁক ছিল। বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সমীহ করতেন এবং তিনি নিজে ছাত্রাবস্থা থাকার সময় ইচ্ছা নির্ভর ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকার সময় তিনি পাঠ্যক্রমে ইংরেজী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন।

উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম নজির মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন, যা আজকের বিদ্যাসাগর কলেজ। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পূর্ণ একক প্রয়াসে খাঁটি স্বদেশী ভাবনা নিয়ে এই কলেজটিকে বানিয়েছিলেন দেশের ছেলেদের জন্য। সুশিক্ষিত ভাবী নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার স্বার্থে। কলেজে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য তিনি একজনও সাহেব অধ্যাপককে নিয়োগ করেননি। আমাদের দেশীয় শিক্ষকদের দ্বারাই ইংরেজী বিভাগকে পরিচালনা করেছেন তাও আবার উনিশ শতকে, এ এক বিদ্যাসাগরের অনন্য কৃতিত্ব। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে বাবু সমাজের এক বিকৃত শিক্ষার পরিচয় আমরা পাই। বিদ্যাসাগর সেই বিকৃত শিক্ষাকে গ্রহণ করেননি। তিনি আমাদের দেশীয় শিক্ষার ধারাবাহিকতাকে অবলম্বন করে বাংলা গদ্য সাহিত্যে আধুনিকতাকে নির্মাণ করলেন। যা ছিল জীবন চালানোর শিক্ষা তাকে তিনি চরিত্র গঠনপোযোগী শিক্ষার দিকে নিয়ে গেলেন।